প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

প্রযুক্তির সঙ্করযুগ

গোলাপ মুনীর

> হাইব্রিড এইজ শুধু প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির যুগ নয়, একই সাথে প্রাযুক্তিক বিনাশ বা টেকনোলজিক্যাল ডিজরাপশনের যুগও। অধ্যাপক ব্রায়ান আর্থার 'দ্য নেচার অব টেকনোলজি'তে লিখেছেন, মানুষ থেকে ব্যতিক্রমী হয়ে প্রযুক্তি একে পরিপক্ব করতে পারে, এতে বৈচিত্র্য আনতে পারে ও মাত্রা বাড়াতে পারে ত্বরান্বিত পর্যায়ে। যত বেশি প্রযুক্তি অস্তিত্বশীল হবে, তত বেশি সংখ্যায় সমাবেশ সম্ভাবনা অর্থাৎ কম্বিনেট্রিয়াল পসিবিলিটিজ বাড়বে।

মানুষ এখন অভিজ্ঞতা লাভ করতে শুরু করেছে পঞ্চম ও সবচেয়ে ব্যাপকভিত্তিক প্রযুক্তি বিপ্লবের। এর মাধ্যমে মানবসমাজের উত্তরণ ঘটছে নতুন এক যুগে। এরই মধ্যে এ যুগটির নাম দেয়া হয়েছে 'টেকনোলজিক্যাল হাইব্রিড এইজ'। বাংলা ভাষায় এ যুগ কী নামে অভিহিত হবে তা এখনো জানা নেই। তবে আমরা যথার্থ যৌক্তিক কারণেই এ যুগকে অভিহিত করতে পারি 'প্রযুক্তির সঙ্করযুগ' নামে। আর এই প্রযুক্তির সঙ্করযুগ আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের একমাত্র উপজীব্য। আগামী দিনের সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যৎ সঙ্করযুগকে বুঝতে ও কার্যকরভাবে বশে আনতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। বুঝতে হবে টেকনোলজিক্যাল ডিজরাপশন তথা প্রাযুক্তিক সংহতিনাশের ঐতিহাসিক ধরনকে। আর এই কাহিনীর শুরু 'টেকনোলজি' শব্দটির মূল অর্থ খোঁজার মধ্য দিয়ে। ওয়েব শুরু হওয়ার আগে 'টেকনোলজি' বলতে বোঝানো হতো সব মৌল ও প্রকৌশল বিজ্ঞানকে : কাঠের তৈরি চাকা থেকে শুরু করে পারমাণবিক বোমা পর্যন্ত সব কিছুকেই বিবেচনা করা হতো প্রযুক্তি হিসেবে। তা সত্ত্বেও বিগত দুই দশকে আমরা শুধু ইন্টারনেট ও যোগাযোগ সেবাকেই প্রযুক্তি বা টেকনোলজি হিসেবে ভাবতে শুরু করেছি। এগুলো এতটাই শক্তিধর হাতিয়ার যে, তা প্রযুক্তির সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কেও আমরা ভুল অনুধাবন করতে শুরু করেছি। কিন্তু আসলে এর ফলে আমরা লক্ষ করছি, প্রযুক্তির বিচিত্রধর্মী নানা ক্ষেত্র : আইটি, বায়ো-টেকনোলজি, কমপিউটার সায়েন্স, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি আরো কত কী! এসব এগিয়ে চলেছে একযোগে। আর শক্তি বাড়িয়ে তুলছে পরস্পরের। সেই সাথে বিশ্ব ইতিহাসের মাত্রায় আনছে এক অবিরপান্তর।

অতীত চার প্রযুক্তিবিপ্লব

আজ পর্যন্ত মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে প্রযুক্তিবিপ্লবের চারটি যুগ :

০১. প্রস্তরযুগ : স্টোন এইজ
০২. কৃষিযুগ : অ্যাগ্রেরিয়ান এইজ
০৩. শিল্পযুগ : ইন্ডাস্ট্রিয়াল এইজ
০৪. তথ্যযুগ : ইনফরমেশন এইজ

প্রস্তরযুগ : আড়াই লাখ বছর আগে আমাদের শিকারি পূর্বসূরি হোমো সেপিয়ানেরা পৃথিবীতে বসবাস করত। উল্লেখ্য, বর্তমানে যে মানবগোষ্ঠী পৃথিবীতে আছে, তাদের নৃতাত্ত্বিক নাম হচ্ছে হোমো সেপিয়ান্স। এরা নানা ধরনের পশুপাখি শিকার করে খাবার সংগ্রহ করত। এসব শিকারে ও অন্য প্রজাতির ওপর প্রাধান্য বিস্তারে এরা ব্যবহার করত পাথরের তৈরি ধারালো অস্ত্র। সে যুগটি মনুষ্যের ইতিহাসে প্রস্তরযুগ নামে পরিচিত।

কৃষিযুগ : দশ হাজার বছর আগে মানুষ আবিষ্কার করে চাকা ও লাঙলের মতো যন্ত্র। এরা এগুলো ব্যবহার করতে শিখে কৃষিকাজে ও পশু পালনে। এর ফলে মানুষ হয়ে ওঠে কৃষক। গড়ে ওঠে কৃষকসমাজ। ছোট ছোট কৃষিসমাজ থেকেই এক পর্যায়ে পাঁচ হাজার বছর আগে গোড়াপত্তন ঘটে প্রথম নগরীর।

শিল্পযুগ : ছাপাখানা ও কারিগরি ঘড়ি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এক বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটে মানবসমাজের। এই অগ্রগতির পথ বেয়েই মানুষ পৌঁছে যায় আঠারোতম শতকের শিল্প বিপ্লবের যুগে। আঠারো ও উনিশতম শতকটি আমাদের কাছে চিহ্নিত শিল্প বিপ্লবের যুগ বলে। এ সময়েই শিল্পযুগে লাগে প্রযুক্তির ছোঁয়া। আসে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও বৃহদাকার উৎপাদন।

তথ্যযুগ : ১৯৭০'র দশকের শেষ দিকে আসে পার্সোনাল কমপিউটার। এর মাধ্যমে সূচিত হয় নতুন আরেক যুগের। সে যুগের নাম তথ্যযুগ বা ইনফরমেশন এইজ। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www) ও মোবাইল ফোন আরো ত্বরান্বিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য সৃষ্টি ও যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময়ের সুযোগ। এই পথ ধরেই সৃষ্টি হয় জ্ঞানকর্মী বা নলেজ ওয়ার্কারের। মাত্র ১৬ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের এক-চতুর্থাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় পার্সোনাল কমপিউটার। আমেরিকার একই পরিমাণ লোকের হাতে মোবাইল ফোন পৌঁছতে সময় নেয় ১৩ বছর, সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ওয়েব পৌঁছতে সময় লাগে ৩ বছর। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তথ্যপ্রযুক্তি আমেরিকার মানুষের হাতে পৌঁছার ফলে যুক্তরাষ্ট্র একটি ম্যানুফ্যাকচারিং তথা ব্যাপক যান্ত্রিক উৎপাদক দেশ থেকে পরিণত হলো ব্যাপক সেবা উৎপাদক অর্থনীতির দেশ হিসেবে। আর এখন এই দেশটির জিডিপির অর্ধেকটাই দখল করে আছে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সেবা খাত।

প্রযুক্তির সঙ্করযুগ

মানুষ এখন এই সময়টায় প্রযুক্তিবিপ্লবের যে যুগের অভিজ্ঞতা লাভ করছে সেটি হচ্ছে পঞ্চম ও সবচেয়ে ব্যাপক প্রযুক্তিবিপ্লবের যুগ। আমরা দ্রুত যুগ পরিবর্তন করে এগিয়ে যাচ্ছি প্রযুক্তিবিপ্লবের সে পরিণত যুগে। ▶

এ যুগের নাম টেকনোলজিক্যাল হাইব্রিড এইজ তথা প্রযুক্তির সঙ্করযুগ। বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাস আমরা এখনো বসবাস করছি ইনফরমেশন এইজ বা তথ্যযুগে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরই মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি একটি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বা রূপান্তর পর্যায়ে বা একটি ঝড় ওঠার পর্যায়ে। এখানে ব্যাপকভাবে পাল্টে যাবে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও বৈশ্বিক-জীবন।

মানুষ ও প্রযুক্তির অর্থাৎ হিউম্যান অ্যান্ড টেকনোলজির এই বিজড়িত হওয়ার জটিল বিষয়টি বর্ণনা করার মতো যথার্থ ইংরেজি শব্দ এখনো সূচিত হয়নি। তবে এর অর্থ প্রকাশ করার মতো সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ হতে পারে জার্মান ভাষার Technik শব্দটি। এর অর্থ শুধু 'টেকনোলজি' নয়, টেকনোলজির পদ্ধতি-প্রক্রিয়া ও আকার-প্রকার সম্পর্কে বিশারদ হওয়ার মতো পর্যায়ে জ্ঞানার্জনও এর আওতাভুক্ত। আজকের দিনের বিকাশমান পৃথিবীতে Technik হচ্ছে আগামী সঙ্করযুগের জন্য প্রস্তুতির বস্তু মাপের পরিধির সূচকের একটা কিছু। এটি আবার সংযোগ ঘটায় প্রযুক্তির বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি মাত্রার। আর এর বিষয়ে হচ্ছে মানুষ ও সমাজে এর প্রভাবের বিষয়টি। অতএব আজকে আমরা যখন গণতন্ত্রের উত্তরণের কথা বলি, তবে আমরা উপলব্ধি করি, আগামী দিনে আমাদের উচিত হবে 'শুদ্ধ টেকনিক'-এর উত্তরণ ঘটানো। পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হাইব্রিড এইজকে ইতঃপূর্বে আসা যুগগুলো থেকে আলাদা করে তোলে :

০১. প্রযুক্তির সর্বব্যাপী উপস্থিতি– Ubiquitous presence of technology

০২. প্রযুক্তির বিকাশমান বুদ্ধিমত্তা– Growing intelligence of technology

০৩. প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান সামাজিক মাত্রা– Increasing social dimension of technology

০৪. নতুন ধরন-ধারণের সাথে যুক্ত ও সমন্বিত হওয়ার প্রযুক্তির সক্ষমতা– Ability of technology to integrate and combine in new forms

০৫. প্রযুক্তির আরো দ্রুত ও বড় আকারের বিনাশী ক্ষমতা, যা মানুষের ইতিহাসে ছিল অনুপস্থিত– Growing power of technology to disrupt, faster and on a larger scale than ever before in human history

প্রথমত, কমপিউটার সুস্পষ্টভাবে হয়ে উঠেছে একই সাথে অধিকতর ক্ষমতাধর ও সন্তাতর। এই প্রবণতা কমপক্ষে আরো এক দশক অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। এরপর আসছে ডিএনএ কমপিউটার। এতে সিলিকন চিপের বদলে ব্যবহার হচ্ছে এনজাইম ও মলিকিউল। এই ডিএনএ কমপিউটার আমাদের উপহার দিতে পারে আরো সস্তা ন্যানোস্কেলের তথা আরো ছোট আকারের কমপিউটার। শিগগিরই অতি ছোট আকারের কমপিউটার ও সেন্সর আমাদের স্মার্টফোন ও ল্যাপটপ থেকে চলে যাবে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের প্রতিটি ছোট ছোট বস্তুতে, এমনকি চলে যাবে আমাদের দেহেও। আইবিএমের অনুমান, ২০১৫ সালের দিকে ১ ট্রিলিয়ন ডিভাইস সংযুক্ত থাকবে ইন্টারনেটের সাথে। এগুলো অব্যাহতভাবে তথ্য বিনিময় ও রেকর্ড করবে। আক্ষরিক অর্থে তখন আমরা বসবাস করব প্রযুক্তির মাঝে।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি শুধু নিছক তথ্যের বোঝা ভান্ডার, অন্য কথায় ডাটা রিপজিটরিজ অব ইনফরমেশন হয়ে থাকবে না। তখন তথ্য বোঝা ও প্রক্রিয়াজাত করার জন্য মানুষের প্রয়োজন হবে না। প্রযুক্তি নিজেই হবে বুদ্ধিমান। প্রযুক্তি নিজেই সক্ষম হবে ডাটা বুঝতে ও সংগ্রহ করতে। সক্ষম হবে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের আওতায় কাজ করতে অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত গেম শো জিওপার্ডিতে আমরা দেখেছি আইবিএম কমপিউটার Watson মানব প্রতিযোগীকে পরাস্ত করেছে। এটি ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের অগ্রগতি। প্রশ্নের ভাষা বুঝে বর্ণনা করে জবাব দিয়ে 'ওয়াটসন' নামের কমপিউটার প্রমাণ করেছে, কমপিউটার ভাষা উপলব্ধি করতে সক্ষম। ভাষা উপলব্ধি করার ক্ষমতা হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ মাত্রার বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। অনেকেই কমপিউটারের এই বুদ্ধিমত্তায় মোটেও বিস্ময় প্রকাশ করেননি। এরা এখন সত্যিকারের হাইব্রিড এইজ তথা প্রযুক্তির সঙ্করযুগের অপেক্ষায়।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তির ধরন ও প্রয়োগ উভয়ই হবে অ্যানথ্রোমরফিক। অর্থাৎ তখন মানুষ ঈশ্বর বা দেবতাকে মানুষের মূর্তিধারী ও মানুষের গুণসম্পন্ন বলে কল্পনা করতে শুরু করবে। 'কণ্ঠ ও অঙ্গভঙ্গি ভিত্তিক নির্দেশ অর্থাৎ 'ভয়েস অ্যান্ড জেসচার-বেজড' কমান্ড যন্ত্রকে করে তুলবে আরো স্বাভাবিক ও মিথস্ক্রিয়। আর যন্ত্র তখন আমাদের সাথে আচরণ করবে অনেকটা মানুষের মতোই। যদিও যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তা হবে আমাদের বুদ্ধিমত্তার তুলনায় নিচু মানের। তবু আমরা দেখতে পাব যন্ত্র ও আমাদের মধ্যে এক ধরনের আবেগী বন্ধন গড়ে উঠেছে। আপনার আইফোনের প্রতি আপনার ভালোবাসা এই শুরু হলো মাত্র। জাপানে এক তরুণ সম্প্রতি বিয়ে করেছে এক ভিডিও গেমের চরিত্রকে। আমরা যত বেশি করে নিমগ্ন হবো অনলাইনে ও ভার্চুয়াল এনভারনমেন্টে, প্রতিবিম্বিত করার পরিবর্তে তত বেশি করে আমাদের অনলাইন আচরণ গঠন করবে আমাদের 'প্রকৃত' আচরণকে।

চতুর্থত, প্রযুক্তির সম্মিলন ঘটবে নতুন ও শক্তিশালী নানা উপায়ে। ভুলে যান ইন্টারনেটের কথা। তখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে নিউরোসায়েন্স ও জীববিজ্ঞান থেকে শুরু করে গণিত ও পদার্থবিদ্যার মিশ্রিতরূপ পর্যন্ত। এরা জন্ম দেবে নতুন নতুন প্রযুক্তিপণ্য। এসব পণ্যের থাকবে অকল্পনীয় ক্ষমতা। এরই মধ্যে হাইব্রিড এইজ আমাদের নিয়ে যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির গতি ছাড়িয়ে জৈবপ্রযুক্তি, ন্যানোপ্রযুক্তি, নির্মলপ্রযুক্তি বা ক্লিন টেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিকের মতো সম্পূর্ণ নতুন নতুন জগতে। একই সাথে জোরালো করে তুলছে প্রচলিত ধারার শিল্প ও জ্বালানিশক্তি উৎপাদনকে। কমপিউটারের খরচ কমে যাওয়ার ফলে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা বেড়েছে। এর ফলে উন্মোচিত হয়েছে ও হচ্ছে উদ্ভাবনের নতুন নতুন দিগন্ত। উদাহরণ টানা যায় বায়োমেকট্রনিকসের। এ বিষয়টি জীববিজ্ঞান, তড়িৎবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যাকে একসাথে নিয়ে এসে সৃষ্টি করেছে জীবনের মতো সজীব প্রসথেটিকস, যা প্রায় আমাদের স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই।

সবশেষে হাইব্রিড এইজ শুধু প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির যুগ নয়, একই সাথে প্রাযুক্তিক বিনাশ বা টেকনোলজিক্যাল ডিজরাপশনের যুগও। Santa Fe Institute-এর অধ্যাপক ব্রায়ান আর্থার 'দ্য নেচার অব টেকনোলজি'তে লিখেছেন, মানুষ থেকে ব্যতিক্রমীহয়ে প্রযুক্তি একে পরিপক্ব করতে পারে, এতে বৈচিত্র্য আনতে পারে ও মাত্রা বাড়াতে পারে ত্বরান্বিত পর্যায়ে। যত বেশি প্রযুক্তি অস্তিত্বশীল হবে, তত বেশি সংখ্যায় সমাবেশ সম্ভাবনা অর্থাৎ কম্বিনেটরিয়াল পসিবিলিটিজ বাড়বে। এর ফলে আমরা পাব আরো নতুন ও জটিলতর পণ্য, যেগুলো শিল্পক্ষেত্রে আনবে বিপ্লব। এ বিষয়টি এরই মধ্যে ঘটিয়েছে জেট ইঞ্জিন ও সেমিকন্ডাক্টর। আর এখন তা ঘটতে যাচ্ছে সফটওয়্যার ও কার্বন নেনোটিউবের সমাবেশের মাধ্যমে। এর শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা ও তাপ সঞ্চালন গুণাবলির সমাবেশ (combination of strength, elasticity, and thermal-conduction properties) হাড় মেরামত থেকে শুরু করে ব্যাটারি মেরামত পর্যন্ত সবকিছুতেই আনতে পারে এক বিপ্লব। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা অব্যাহতভাবে দেখব টেকনোলজির পুরনো বিজনেস মডেলকে এক পাশে সরিয়ে দিচ্ছে। কারণ, প্রযুক্তি দিনকে দিন আগের চেয়ে দ্রুততর সময়ে বাজারে আসছে। আর তাতে শুধু বিজনেস মডেলই ক্ষতির মুখে পড়বে না। আসন্ন 'ডু-ইট-ইউরসেলফ ম্যানুফেকচারিং'-এর আবির্ভাবের কথাই ধরুন। প্রথম নজরেই দেখা যাবে এই সহজলভ্য ডিজাইনার ডিভাইস ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে মম-অ্যান্ড-পপ শপগুলোর। এসব ছোট ছোট দোকান এই ডিজাইন ডিভাইস কাজে লাগিয়ে অনেক কম খরচে পোশাক-আশাক টেইলারের মতো কেটে সেলাই করে দিতে পারবে। এসব ডিভাইস হুমকির মুখে ফেলে দেবে চীনের মতো দেশের বড় বড় উৎপাদন ঘাঁটিগুলোকে। অপরদিকে তা পুনরুদ্ধার করবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনের ফলে সেখানে সুদের হার আকাশচুম্বী হতে পারে এবং অর্থনীতি আবার উত্তপ্ত হতে পারে। অতএব যে হাইব্রিড এইজের প্রত্যাশা আপনি করছেন, সে সম্পর্কে সতর্ক আমাদের থাকতে হবে বৈ কি! কেননা 'হাইব্রিড এইজ ইজ অলসো অ্যান এইজ অব ডিজরাপশন'।

হাইব্রিড বিমান

এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে হাইব্রিড এইজে পৌঁছার দৌড়। শুরু হয়ে গেছে ইন্টেলিজেন্স এমবেডিংয়ের দৌড়। আজকের পৃথিবীতে আছে ৮০০,০০০,০০০টিরও বেশি পিসি। প্রতি সাত বা আটজনের জন্য রয়েছে একটি পিসি। আর পৃথিবীতে এখন আছে ৫০,০০০ কোটি কমপিউটার চিপ। অনেক চিপে রয়েছে ১০ কোটির চেয়েও বেশি ট্রানজিস্টর– অন-অফ সুইস। হিউলেট প্যাকার্ড কোম্পানি ঘোষণা করেছে, এরা একটি মলিকুলার সাইজের বিলিয়ন বিলিয়ন, এমনকি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ক্ষুদ্রাকার অন-অফ সুইচ একটি একক চিপের ওপর স্থাপন করার উপায় খুঁজে পেয়েছে।

হাইব্রিড এইজের দৌড়

এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে হাইব্রিড এইজে পৌঁছার দৌড়। শুরু হয়ে গেছে ইন্টেলিজেন্স এমবেডিংয়ের দৌড়। আজকের পৃথিবীতে আছে ৮০০,০০০,০০০টিরও বেশি পিসি। প্রতি সাত বা আটজনের জন্য রয়েছে একটি পিসি। আর পৃথিবীতে এখন আছে ৫০,০০০ কোটি কমপিউটার চিপ। অনেক চিপে রয়েছে ১০ কোটির চেয়েও বেশি ট্রানজিস্টর– অন-অফ সুইস। হিউলেট প্যাকার্ড কোম্পানি ঘোষণা করেছে, এরা একটি মলিকুলার সাইজের বিলিয়ন বিলিয়ন, এমনকি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ক্ষুদ্রাকার অন-অফ সুইচ একটি একক চিপের ওপর স্থাপন করার উপায় খুঁজে পেয়েছে।

আজকের দিনে পৃথিবীতে মাথাপিছু মানুষের জন্য প্রায় ৪০০ কোটির মতো ডিজিটাল সুইচ অন-অফ ক্লিক করছে। আজ প্রতিবছর আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ১০,০০০ কোটি চিপ আসছে। ২০০২ সালে জাপানিরা আর্থ সিমুলেটর নামের একটি কমপিউটার তৈরি করে। এটি তৈরি করা হয়েছে বৈশ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়ার জন্য। এটি প্রতি সেকেন্ডে ৪০,০০,০০০ কোটি ক্যালকুলেশন সম্পন্ন করে। এই কমপিউটার ক্যালকুলেশন করে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে। ২০০৫ সালের মধ্যে আইবিএম দাবি করে, এই কোম্পানি একটি সুপার কমপিউটার নির্মাণ করেছে, যা তার চেয়েও দ্বিগুণ গতিতে ক্যালকুলেশন করতে পারে। তখন বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, কমপিউটার petaflop speed-এ গিয়ে পৌঁছতে পারে– অর্থাৎ তখন কমপিউটার প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ ট্রিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারবে। তা সম্ভব হবে এক দশক সময়ের মধ্যেই।

এদিকে এক অনুমিত হিসাবে পৃথিবীতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ধরা হয়েছে ৭০০,০০০,০০০ থেকে ৯০০,০০০,০০০ জন। আসলে আমরা কেউ কি সত্যিকার অর্থে চিন্তা করেছি– এই সব চিপ, কমপিউটার, কোম্পানি, ইন্টারনেট কানেকশন অস্তিত্ব হারাতে বসেছে? কিংবা আমরা কেউ কি ভেবেছি– বিশ্বের ১,৪০০০,০০০,০০০ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী এক সময় ছুড়ে ফেলে দেবে তাদের ফোনসেট? আসলে সময়ের সাথে এদের হাতে আসবে আরো অগ্রসরমানের স্বচ্ছন্দ ডিজিটাল ডিভাইস। অতএব আমরা দেখছি সমাজে দ্রুত একটা পরিবর্তন আসছে।

সমাজে আসবে একটা নলেজ স্ট্রাকচার বা জ্ঞানকাঠামো। আর এমনটি ঘটবে না শুধু গুটিকয়েক উন্নত দেশেই। অনুন্নত দেশগুলোতেও আসবে সে পরিবর্তন। টাঁদা ভাষা শিগগিরই হয়ে উঠবে ইন্টারনেটে সবচেয়ে বেশি ব্যবহারের ভাষা। কোরীয় বালক-বালিকারা এখন চেটিং করে হাজার হাজার ইন্টারনেট ক্যাফেতে। এসব ইন্টারনেট ক্যাফেতে এরা খেলছে মাল্টি-ইউজার কমপিউটার গেম, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ গেমারেরা রয়েছে ডেনমার্ক কিংবা কানাডায়। কোস্টারিকা, আইসল্যান্ড, ও মিসর রফতানি করে সফটওয়্যার। ভিয়েতনামের প্রত্যাশা আগামী পাঁচ বছরে এর রফতানি পৌঁছবে ৫০০,০০০,০০০ ডলারে।

এখন ব্রাজিলে আছে ১৪,০০০,০০০ ইন্টারনেট ইউজার। আর এর রেসিফে শহর বেশ কিছু বিদেশী তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিকে আকর্ষিত করতে পেরেছে। এগুলোর মধ্যে আছে মাইক্রোসফট ও মটোরোলা। এ শহরে আছে কয়েকশ' দেশীয় কোম্পানি। জাতিসংঘ টাস্কফোর্সের মতে, বিগত পাঁচ বছরে আফ্রিকায় মোবাইল বিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে এখনো সেখানে ডিজিটাল বিভাজন ব্যাপক হলেও সাইবার ক্যাফে ও টেলিসেন্টারের সংখ্যা বাড়ছে।

ফুয়েল ইলেকট্রিক হাইব্রিড কার

সঙ্করযুগ ও টফলার দম্পতি

Alvin Toffler এবং Heidi Toffler। আমেরিকান লেখক ও ফিউচারিস্ট। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী দম্পতি। Tofflersরূপী বহুবচনবাচক শব্দের মধ্যে এ দু'য়ে মিলে একাকার। স্বামী-স্ত্রী সহযোগে গড়ে ওঠা এক বুদ্ধিজীবী দল হিসেবে তাদের পরিচিতি বিশ্বজুড়ে। এই বুদ্ধিজীবী দম্পতি এখন ওকটাজেনারিয়ান। আমাদের ভাষায় অশীতিপর। সরল কথায় এদের বয়স আশি বছরেরও বেশি। ১৯৭০ সালে লেখা Future Shock এবং ১৯৮০ সালে লেখা The Third Wave নামের দু'টি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী বেস্টসেলার বই থেকে শুরু করে এই টফলার দম্পতির কাছ থেকে পেয়েছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই। এই বই দু'টির লেখক হিসেবে আমরা পাই অ্যালভিন টফলারকে। কিন্তু এরা যৌথভাবে লিখেছেন 'ক্রিয়েটিং অ্যা নিউ সিভিলাইজেশন : দ্য পলিটিকস অব দ্য থার্ড ওয়েভ' নামের একটি বই এবং 'রিভেলিউশনারি ওয়েলথ' নামের আরেকটি বই। এ ছাড়া এই দম্পতি ড্রিন আর. জোনসকে সাথে নিয়ে লিখেছেন 'সাইবারক্লুলস : অ্যান এডুকেশন রেনেসাঁস' নামে আরেকটি বই। এসব বেস্টসেলার বইয়ের মাধ্যমে এই বুদ্ধিজীবী লেখক দম্পতি বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষকে সহায়তা করেছেন অনাগত ভবিষ্যতের পৃথিবীটিকে উপলব্ধি করতে। মানুষকে শিখিয়েছেন আজকের ও আগামীর অতি দ্রুতগতির পৃথিবীতে তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামষ্টিক জীবনকে বুঝতে। পরিবারিক ও সামাজিক, গণমাধ্যম ও সামরিক, ব্যবসায়িক ও আমলাতান্ত্রিক বিষয়াবলির ওপর আলোকপাত করে ▸

টফলার দম্পতি তৈরি করতে প্রয়াসী হয়েছেন আগামী দুনিয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য। আন্তর্জাতিক টাইম ম্যাগাজিন এই বুদ্ধিজীবী দম্পতির এ ক্ষেত্রে ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করেছে এভাবে: They 'set the standard by which all subsequent would-be futurist have been measured'.

সুপ্রিয় পাঠক, জানি না আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'ফিউচার শক' এবং 'দ্য থার্ড ওয়েভ' নামের বই দু'টি এই মুহূর্তে আপনার হাতের কাছে আছে কি না। কিংবা কখনো বই দু'টি পড়ার সুযোগ আপনার হয়েছে কি না। টফলার দম্পতির লেখা অন্য কোনো বইও আপনার পড়া হয়েছে কি না। কয়েক দশক আগে লেখা এ বইগুলো এখন হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলে আপনি নিশ্চিত অবাক হবেন। কারণ, এই দম্পতি তাদের বইগুলোতে যে ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, সেসব পরিবর্তন আজকের এই দিনে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে লেখা এই বই 'ফিউচার শক' ও 'দ্য থার্ড ওয়েভ'-এ রয়েছে আমাদের চমকে দেয়ার মতো অন্তর্দৃষ্টি ও সুদূরদৃষ্টিসম্পন্ন বক্তব্য। আর এরা তা তুলে ধরেছেন তাদের অনবদ্য গদ্যশৈলীতে। আর এজন্যই তিন-চার দশক আগে লেখা বইগুলো এখনো আমাদের জন্য রয়ে গেছে অপরিহার্য পাঠ্য হিসেবে। প্রথমে উল্লিখিত দু'টি বই এখন পড়তে বসে যদি ভাবতে শুরু করেন বই দু'টি আজকের এই সময়ে লেখা হয়েছে, তবে আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তোলার সুযোগ নেই। যেসব পদবাচ্য ও ধারণা আজ আমাদের সবার মুখে মুখে, সেগুলোই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এ বই দু'টির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাজুড়ে। শিল্পায়নবাসের সঙ্কট (ক্রাইসিস অব ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম), নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতিশ্রুতি (প্রমিজ অব রিনিউয়েবল এনার্জি), ব্যবসায়ে সাময়িকবাস (অ্যাড-হোক্রেসি ইন বিজনেস), অ-পারমাণবিক গোষ্ঠীর উত্থান (রাইজ অব নন-নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি), প্রযুক্তিসমৃদ্ধ যোগাযোগ (টেকনোলজি এনাবল্ড কমিউনিকেশন), ভোক্তা-অসুকূলতার শক্তি (পাওয়ার অব প্রো-জুমার), সেন্সর জুড়ে দেয়া সাংসারিক কাজের যন্ত্রপাতি (সেন্সর এমবেডেড ইন হাউসহোল্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস), এমন একটি জিন শিল্প, যা আগে থেকেই মানবদেহের নকশা হাজির করতে সক্ষম (অ্যা জিন ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট প্রি-ডিজাইনস দ্য হিউম্যান বডি), করপোরেশনের সামাজিক দায় (করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি), গাঁদা গাঁদা তথ্য (ইনফরমেশন ওভারলোড) ইত্যাদি পদবাচ্য ও ধারণা পাওয়া যাবে 'দ্য থার্ড ওয়েভ' নামের বইটিতে। এই বইটিকে আজ অনেকেই আখ্যায়িত করছেন 'ক্ল্যাসিক স্টাডি অব টুমরো' তথা 'আগামী দিনের ধ্রুবপদ পাঠ' নামে। আর এই আখ্যায় ফার্স্ট, এ বিষয়ে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই।

ব্যক্তিগতভাবে এই টফলারস তথা টফলার দম্পতি ছিলেন বরাবর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। তাদের চেষ্টা ছিল আমেরিকার কংগ্রেসীয় অচলাবস্থা, এশীয়দের প্রযুক্তির প্রতি আবিষ্টতা ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির জড়তার মধ্যে একটা সংযোগ গড়ে তোলা। কিন্তু টফলার দম্পতির মধ্যে দীর্ঘদিনের বিশেষ দিক ছিল আজকের দিনের সমাজ সম্পর্কে তাদের অন্তর্দৃষ্টি, যা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। এরা আজকের সমাজ সম্পর্কে যা তখন বলেছেন, তখনকার অনেকের ভাবনা-চিন্তায় তা ছিল পুরোপুরি অনুপস্থিত। তখনকার প্রচলিত প্রজ্ঞাদৃষ্টি ছিল ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে নাগরিক-সাধারণকে সাদাসিধে পোশাক পরা 'গণমানব' তথা 'মাসম্যান'-এ রূপান্তর করা। কিন্তু টফলার দম্পতির দৃষ্টি ছিল সরলীকরণ ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় এক সুপার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি তৈরি করা। তিনি তা চিন্তা করেছেন সেই সমাজে দাঁড়িয়ে, যে সমাজের মানুষ কোনোভাবেই অবহিত ছিল না অগ্রসর যোগাযোগ প্রযুক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে। কিন্তু টফলার দূরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন টেলিফোনি ও ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড আমাদেরকে বাধ্য করবে আরো সৃজনশীল উপায় উদ্ভাবনে, যাতে করে আমরা এড়াতে পারি অতিমাত্রিক প্ররোচণা আর রক্ষা করতে পারি আমাদের প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা। আজকের সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে ইন্টারনেটের প্রতি অতিমনোযোগী হওয়াকে বলা হচ্ছে একটি নেশা বা আসক্তি হিসেবে। মনে হচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে এটি এমন একটি পর্যবেক্ষণ যে, এমনকি রোগও সৃষ্টি করা যাবে প্রায়ুক্তিকভাবে। টফলারের 'ফিউচার শক' যেমনি একটি 'অসুস্থতা', তেমনি 'জীবনের এক উপায়'।

টফলার দম্পতি এখন লিখছেন তাদের সর্বশেষ বই। এটি তাদের স্মৃতিকথা। এতেও থাকছে কিছু কাটিং-এজ আইডিয়া। এরা এদের যুক্তিবলে নতুন যে ধারণার উদ্ভাবন করেছেন, তার নাম দিয়েছেন : ফিউচারিজম। কিন্তু এরা কিভাবে তা সম্পন্ন করলেন?

হতে পারে, এই শব্দটির নামটি এরা পেয়েছেন ইতালীয় ফ্যাসিবাদী কবি ফিলিপ্পো ম্যারিনেত্তোর কাছ থেকে, যিনি ১৯০৯ সালে প্রণয়ন করেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট 'ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো'। কিন্তু টফলার দম্পতি ফিউচারিজমকে করে তোলেন সত্যিকারের এমন এক আখ্যান, যা আসলেই কার্যকর। টফলার দম্পতি সে পথ করে দিয়েছেন। মন্দা-উত্তর আমেরিকায় বেড়ে ওঠা এই দম্পতি নিউইয়র্ক শহর ছেড়ে চলে যান মধ্য-আমেরিকা অঞ্চলে। সেখানে কয়েক বছর কাজ করেন একটি অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই কারখানায় ওয়েল্ডার ও ইউনিয়ন স্টুয়ার্ড হিসেবে। সেখানেই সর্বোচ্চমাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজমের কষ্ট আর বিপন্নাবস্থা সম্পর্কে। আর সেভাবেই সেই অর্গল ভেঙে এরা ধারণা করতে পেরেছিলেন আগামী দিনে কী আসছে।

ভবিষ্যতে কী ঘটবে না ঘটবে, সে সম্পর্কে আভাস দেয়া এমন নয় যে, নিজেকে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ রেখে একটি স্ক্রিনের বলে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে তা উদঘাটন করা। এক বিবেচনায় এটি জনতার মাঝে ডুকে পড়ে প্রান্তিক যন্ত্রণা সম্পর্কে এক ধরনের রিপোর্টিং– নাছোড়বান্দার মতো পরিভ্রমণ, বিভিন্ন স্থান সফর, সাক্ষাৎকার নেয়া এবং নিজেরা সাংবাদিকের মতো লেগে থাকা। টফলার দম্পতি তাদের টুকরো টুকরো চিন্তা-ভাবনাকে জোড়া লাগিয়ে রচনা করেছেন এক 'ইলুসিভ ফিউচার' বা 'ছলনাময় ভবিষ্যৎ'। এরা কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেননি, উদ্ভাবন করেননি কোনো প্রযুক্তি, কিংবা চালু করেননি কোনো ব্র্যান্ড-নেম বিজনেস। তবে এরা অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন ভাষার নতুন শব্দাবলি উপহার দিতে। এর মাধ্যমে উপায় উপস্থাপন করেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আন্তঃসংযোগ ঘটানোর। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মূলধারার কয়টি বই আছে, যাতে বলা ছিল মিডিয়া চ্যানেলের মাল্টিপ্লেকশনের বা বহুগুণায়নের মাধ্যমে অনেক ব্যক্তি সক্ষম হয়ে উঠবেন তাদের নিজস্ব বাস্তবতা গড়ে তুলতে।

'দ্য থার্ড ওয়েভ' বইয়ে টফলার দূরদৃষ্টি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, অগ্রসর সমাজ আর পরিতৃপ্ত থাকবে না মানবসমাজের সর্বোচ্চ সীমার ক্রমবিকাশেও। লিখেছেন– বরং এর পরিবর্তে আমরা ধাবিত হচ্ছি এক সাহসী নতুন দুনিয়ায় (We are moving into a brave new world.), যেখানে 'নলেজ' হবে এক অফুরান পণ্য তথা ইনএকজস্টিবল কমোডিটি। আর তা শুধু আমাদের অর্থনীতিকেই পাল্টে দেবে না, বরং আরো গভীরভাবে পাল্টে দেবে আমাদের ধারণা– বুঝতে শেখাবে আমরা আসলে কে। তা শুধু এক প্রজন্মের বেলায়ই সত্য হবে না, সত্য হবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চিরদিনের জন্য। এমনটিই উল্লেখ রয়েছে এ সম্পত্তির লেখালেখিতে।

২০০২ সালে জাপানিরা অর্থ সিমুলেটর নামের একটি কমপিউটার তৈরি করে। এটি তৈরি করা হয়েছে বৈশ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়ার জন্য। এটি প্রতি সেকেন্ডে ৪০,০০,০০০ কোটি ক্যালকুলেশন সম্পন্ন করে। এই কমপিউটার ব্যালকুলেশন করে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে। ২০০৫ সালের মধ্যে আইবিএম দাবি করে, এই কোম্পানি একটি সুপার কমপিউটার নির্মাণ করেছে, যা তার চেয়েও দ্বিগুণ গতিতে ক্যালকুলেশন করতে পারে। তখন বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, কমপিউটার petaflop speed-এ গিয়ে পৌঁছতে পারে– অর্থাৎ তখন কমপিউটার প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ ট্রিলিয়ন ব্যালকুলেশন করতে পারবে।

হাইব্রিড ল্যাপটপ ট্যাবলেট

হাইব্রিড মনিটর

হাইব্রিড কমপিউটার

হাইব্রিড ক্যামেরা

সঙ্করযুগের ব্যাটারি

সুপরিচিত জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি বা জিই কোম্পানি বড় আকারের বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য উদ্ভাবন করতে যাচ্ছে আগামী প্রজন্মের ব্যাটারিপ্রযুক্তি। ঐতিহাসিকভাবে ব্যাটারিতে ছিল ও আছে বেশকিছু বিচ্যুতি ও অক্ষমতা। এগুলো বড় আকারে হাইব্রিড ও ইলেকট্রিক গাড়ির বাণিজ্যিকায়নের পথে বাধা হয়ে আছে। বাধা হয়ে আছে এসব গাড়ির কার্যক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দাম কমানোর পথেও। জিই'র ব্যাটারি প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষকেরা এসব ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছেন।

'জিই গ্লোবাল রিসার্চ'-এর কেমিক্যাল এনার্জি সিস্টেম ল্যাবে উদ্ভাবন করা হচ্ছে এমন ব্যাটারি প্রযুক্তি, যা ব্যবহার করা হবে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিকায়িত হাইব্রিড ফ্রেইট লোকোমোটিভে। আর এ ধরনের লোকোমোটিভও উদ্ভাবন করছে জিই। জিই'র ফুয়েল-এফিশিয়েন্ট রোড-বেসড ভেহিকলের মতোই এর হাইব্রিড লোকোমোটিভও এর ব্রেকিং এনার্জি আবার পুনরুদ্ধার করে জ্বালানি খরচ কমাতে পারবে ১০ শতাংশ পর্যন্ত। এক হিসাবমতে, প্রতিটি লোকোমোটিভ বছরে জ্বালানি বাঁচাতে পারবে ৩২ হাজার গ্যালন ডিজেল।

এই ফলোৎপাদনের জন্য জিই কোম্পানির গবেষকেরা একটি আদর্শ মানের ব্যাটারি রসায়ন উদ্ভাবন করছেন। এর মাধ্যমে ব্যাটারি সমস্যার কারিগরি দিক থেকে কার্যকর সমাধান টানা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে টেকসই করে তোলা হবে। তা ছাড়া জিই হাইব্রিড লোকোমোটিভের জগৎ ছাড়িয়ে আরো বেশ কিছু চমৎকার অ্যাপ্লিকেশনের দিকে নজর দিচ্ছে– যেখানে আছে ব্যাক-আপ পাওয়ার থেকে শুরু করে প্লাগ-ইন ইলেকট্রিক ভেহিকল পর্যন্ত।

ব্যাটারিগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল উপাদান। জিই'র গবেষকেরা এগুলোর সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সিস্টেম উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এ সিস্টেম কাজ করতে সক্ষম হবে একটি প্রবল প্রতিকূল পরিবেশেও। আর এই সিস্টেমটির থাকবে একটি সুদীর্ঘ অপারেটিং লাইফ।

বিশ্বব্যাপী উন্নীত ইলেকট্রিক পরিবহনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। জিই'র চমৎকার সব ব্যাটারি টেকনোলজি হাইব্রিড যুগের এই বাস্তব চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

এক প্রজন্মের পর আমরা যদি এমন একটি আগমান ভবিষ্যতকে বুঝতে চাই, যেখানে প্রযুক্তি নিজেকে কৌশলে পদার্পিত করেছে মানুষের সব কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে, স্তরে ও কোণায়। তবে এখন সময় হচ্ছে টফলার দম্পতির পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন। ভুললে চলবে না, প্রযুক্তির এ পদবিক্ষেপ ডিএনএ'র নিপুণ ব্যবহার ও পুনরাবৃত্তি থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এর মাঝেই মানুষ অব্যাহতভাবে উপায়ের সন্ধানে আছে জৈবিক বিবর্তনে গতি আনার জন্য, যাতে তাকে প্রাযুক্তিক বিবর্তনের প্রবল বেগের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়। তা করার একমাত্র পথ হচ্ছে, ক্রমবর্ধমানহারে প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন ও উদ্ভাবনের এক যুগের সূচনা করা। আর সেই যুগেরই নাম দেয়া হয়েছে প্রযুক্তির সঙ্করযুগ তথা হাইব্রিড এইজ। এ হচ্ছে সে যুগ, যে যুগে প্রযুক্তি প্রভুত্ব কায়েম করবে মানুষের জীবনের ওপর।

ফার্স্ট ওয়েভ যদি হয়ে থাকে কৃষিযুগ ও উপজাতি অধ্যুষিত (অ্যাগ্রেরিয়ান অ্যান্ড ট্রাইবাল), তবে সেকেন্ড ওয়েভ ছিল শিল্পযুগ ও জাতীয় যুগ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ন্যাশনাল), থার্ড ওয়েভ ছিল তথ্যগত ও জাতিঊর্ধ্ব যুগ (ইনফরমেশনাল অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল)। এরপর আসে হাইব্রিড এইজ বা সঙ্করযুগ। এ যুগকে টফলার নাম দিয়ে থাকতে পারেন ফোর্থ ওয়েভ। এই নতুন যুগে 'মানব বিবর্তন' (হিউম্যান ইভোলিউশন) রূপ নিয়েছে 'মানবপ্রযুক্তি সহবিবর্তনে' (হিউম্যান-টেকনোলজি কো-ইভোলিউশনে)। এর ফলে আমরা হয়ে উঠছি যন্ত্রের অংশ এবং যন্ত্রও হয়ে উঠছে আমাদের অংশ।

এই হাইব্রিড যুগে একটি সমাজ থেকে আরেকটি সমাজকে আলাদা করবে শুধু তাদের ভূগোল, সংস্কৃতি, তাদের আয়ের মাত্রা কিংবা অন্যান্য প্রচলিত নিয়ামক দিয়ে নয়– বরং আলাদা করবে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর তাদের ক্ষমতা বিবেচনা করে। আমরা বিভিন্ন স্থানে বাস করব না, যদি না আমরা বাস করি Technik-এর বিভিন্ন স্তরে।

১৯৭০-এর দশকে টফলার দম্পতি অনুমান করেছিলেন– কয়েক লাখ মানুষ তাদের প্রাযুক্তিক সংযুক্ততা ও অধিকতর গতিশীল জীবনযাপনের জন্য ইতোমধ্যেই বসবাস করছিলেন 'ইন দ্য ফিউচার'-এ, অর্থাৎ ভবিষ্যতের মাঝে। আজকের দিনে শুধু টোকিওতেই কয়েক লাখ মানুষ বসবাস করছে 'ইন দ্য ফিউচার'-এ। জাপানের সমাজে তরুণদের ক্লাস নিচ্ছে রোবট, রোবটগুলো দেখাশোনা করছে ও সঙ্গ দিচ্ছে প্রবীণদের। তরুণদের উপস্থাপন করছে ভালোবাসার 'ভার্চুয়াল অবতার' হিসেবে। জাপান সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্লেষণ হচ্ছে– দেশটি 'মৃত্যু'র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ, এর ব্যাপক জনসংখ্যাগত পতন তথা ডেমোগ্রাফিক ডিক্লাইন। কিন্তু দেশটি টুকরো টুকরো করে বেশ বিকশিতও হচ্ছে। অপরদিকে ভারতের মতো একটি দেশ প্রবল গতিবেগের মাঝে বসবাস

হাইব্রিড ঘড়ি

হাইব্রিড পেনড্রাইভ

হাইব্রিড প্রিন্টার

হাইব্রিড টিভি

হাইব্রিড মোবাইল ফোন

করেও প্রমাণ করেছে– উচ্চহারে মোবাইল ফোন ও বায়োমেট্রিক ন্যাশনাল কার্ড ব্যবহার করে, অনুন্নত প্রত্যন্ত গ্রামে ডিজিটাল কিয়স্ক স্থাপন করে এবং অভিজাত 'রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট' প্রণয়নসূত্রে ইন্টারনেটে সব আইন প্রকাশ করে দেশের Technik-এর উত্তরণ ঘটানো যায়।

কে-টুলস

হাইব্রিড যুগে উত্তরণের এই ডিজিটাল বিপ্লব আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেও বিস্তৃত করছে চারদিকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন পরীক্ষায় নামছেন 'ডার্কমেটার' নিয়ে। বৈজ্ঞানিকভাবে অ্যান্টিমেটারের প্রমাণ পাওয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে অ্যান্টি-হাইড্রোজেন। আমরা ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছি বৈচিত্র্যের কাঙ্ক্ষিত পলিমার, কমপোজিট ম্যাটেরিয়াল, এনার্জি, মেডিসিন, মাইক্রোইলেকট্রনিক্স, ক্লোনিং, সুপ্রা-মলিকুলার কেমিস্ট্রি, অপটিক্স, মেমরি রিসার্চ, ন্যানোটেকনোলজি ও আরো শত শত ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে অতিসম্প্রতি সে দেশের গবেষণা খাতে, বিশেষ করে মৌল বিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণা খাতে খরচ কমিয়ে দেয়ার ব্যাপারে যৌক্তিক কারণেই নিন্দা জানিয়েছেন। এখন বিশেষ এক শ্রেণীর প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান গবেষকদের সামনে হাজির করছে অত্যাধুনিক সব গবেষণাযন্ত্র। এগুলোর নাম দেয়া হয়েছে K-tools বা নলেজ-টুলস। এসব যন্ত্রপাতি আমরা ব্যবহার করছি জ্ঞান সৃষ্টির কাজে, জ্ঞানের গভীরে পৌঁছার জন্য। আর জ্ঞান হচ্ছে সঙ্করযুগের অগ্রসর অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলধন।

এখন অতিউন্নত সুপার কমপিউটার, সুপার সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ও ওয়েব কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তোলার মোক্ষম সব হাতিয়ার হাতে পাচ্ছেন। এরা এখন বর্ধিত সংখ্যায় গড়ে তুলছেন মাল্টিন্যাশনাল টিম। আরেকগুচ্ছ কে-টুলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ল্যাবরেটরিতে ভিজ্যুয়ালাইজেশন ইনস্ট্রুমেন্ট। নীতিগতভাবে গবেষকেরা খুব শিগগিরই ভিজ্যুয়াল অবজারভেশনের মাধ্যমে পরিভ্রমণ করতে পারবেন একটি চালের দানার ভেতরে। জানতে পারবেন এর অভ্যন্তরীণ কাঠামো। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকীগুলোতে এখন প্রচুর বিজ্ঞাপন থাকে উন্নততর, দ্রুততর সময়সাশ্রয়ী নানা প্রযুক্তির। এগুলোতে প্রায়ই লেখা থাকে 'অটোমেইট ইওর রিসার্চ'। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ গবেষণাযন্ত্র দিয়ে আজকাল দুই ঘণ্টারও কম সময়ে যেকোনো সেম্পল প্রসেস করে ডিএনএ, আরএনএ, এমআরএনএ এবং ভাইরাল নিউক্লিক অ্যাসিড আলাদা করা যায়। চল্লিশ মিনিটেরও কম সময়ে সম্পন্ন করা যায় রিয়েল টাইম পিসিআর অ্যানালাইসিস। সম্প্রতি ওলন্দাজ ও ফরাসি লেজার বিজ্ঞানীরা ২২০ অ্যাটোসেকেন্ড (1 attosecond = এক সেকেন্ড সময়ের শতকোটি ভাগের শতকোটিতম ভাগের একভাগের সমান সময় অর্থাৎ বিলিয়নথ্‌স অব অ্যা বিলিয়নথ অব অ্যা সেকেন্ড) স্থায়ী ফ্ল্যাশলাইট তৈরির রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তখন ভেতরে কী ঘটে সে সম্পর্কে জানার গবেষণা এখনো খুবই ধীরগতিতে চলছে। অতএব আমেরিকান গবেষকেরা কাজ করছেন একটি Lasetron-এর ওপর। এটি ডিজাইন করা হয়েছে ফ্ল্যাশ তৈরির জন্য, যা পরিমাপ করা হয় Zeptosecond-এ। উল্লেখ্য, এক জেপটোসেকেন্ড = এক সেকেন্ডের ট্রিলিয়ন ভাগের শতকোটিতম ভাগের একভাগের সমান সময় অর্থাৎ বিলিয়নথ্‌স অব অ্যা ট্রিলিয়নথ অব অ্যা সেকেন্ড।

এই ব্যাপক-বিস্তৃত আলাদা আলাদা এসব ক্ষেত্রের পরবর্তী পদক্ষেপ খুবই স্পষ্ট। খুব শিগগিরই আমরা শুধু জ্ঞানার্জনের কাজে লাগানোর অতি আকর্ষণীয় যন্ত্রপাতিই দেখতে পাব না, বরং সেই সাথে দেখতে পাব এসব যন্ত্রপাতি তৈরিরও আকর্ষণীয় নানা যন্ত্র।

আরো বেশিসংখ্যক বিজ্ঞানী, আরো বেশি শক্তিশালী কে-টুল, তাৎক্ষণিক যোগাযোগ, ব্যাপকভিত্তিক সহযোগিতা, আরো বিস্তৃত জ্ঞানের ভিত্তি ইত্যাদি সবকিছু মিলে বিজ্ঞান পাল্টে দিচ্ছে এর নিজের সীমারেখাও। উত্তর এনে হাজির করছে সেই সব প্রশ্নের, যা একসময় চাওয়া হতো বিজনেস-মুক্ত সায়েন্স ফিকশনে। বিজ্ঞানীরা আজ আর টাইম-ট্রাভেল, সাইবোর্গস, নিয়ার ইমমরটালিটি ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে আর ভয় করেন না। অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ডিভাইস সম্পর্কেও এরা এখন কথা বলতে চাচ্ছেন। এই ডিভাইস পাল্টে দিতে পারে ওষুধ, দিতে পারে অফুরান ফসিল জ্বালানির উৎস এবং এক সময়ের অবিশ্বাস্য আরো অনেক কিছুই। দিনের পর দিন গবেষণাগারগুলো থেকে আসছে আবিষ্কারের পর আবিষ্কারের ঘোষণা।

যতই এগিয়ে যাচ্ছি সঙ্করযুগে

আমরা যতই প্রযুক্তিক সঙ্করযুগের দিকে তথা টেকনোলজিক্যাল হাইব্রিড এইজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে– যিনি বা যে জাতি বা দেশ সক্ষমতা অর্জন করবে প্রযুক্তি, মূলধন ও সত্তার প্রতিচ্ছেদ (ইন্টারসেকশন অব টেকনোলজি, ক্যাপিটাল অ্যান্ড আইডেন্টিটি) ব্যবস্থাপনার, সেই হবেন বা হবে ক্ষমতার কেন্দ্র। রাজনীতির নতুন কেন্দ্র শুধু দেশ হবে না, বরং হবে চারটি C : countries, cities, companies, and communities। এরই মধ্যে আমরা দেখছি, 'সরকার দেয় নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি– গভর্নমেন্টস প্রোভাইড সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রসপারিটি' ধরনের উনবিংশ শতাব্দীর বদ্ধমূল ধারণাগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে সরে এসে এমন স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে যে, বেশিরভাগ দেশেই 'প্রাইভেট সেক্টর জেনারেটস গ্রোথ অ্যান্ড প্রসপারিটি' এবং তা শেষ পর্যন্ত দেশে ও সমাজে আনে স্থিতিশীলতা। সরকারগুলোর মধ্যে আছে নানা পর্যায়। এক পর্যায়ের সরকার তাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এরা সক্রিয়থাকতে সক্ষম এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্তা গড়ে তুলতে পারে, যেমন– সিঙ্গাপুর ও চীন। আরেক পর্যায়ের সরকার আছে, যারা যেখানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যৌথ উদ্যোগ চলছে একটি কার্যকর শ্রমবিভাজনের, যেমন– ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র। আরেক পর্যায়ের সরকার আছে, যাদের করার মতো ক্ষমতা খুবই কম– এর আওতায় পড়ে উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়া দেশগুলো। ফেসবুক অথবা গুগলে চাকরিরতরা তাদের দিন কাটাতে পারে ক্যাম্পাসে। আর ক্যাম্পাসগুলো পুরোপুরি একেকটি সার্ভিস কমিউন। একই ঘটনা ঘটছে রাশিয়া, ভারত ও চীনের কোম্পানিগুলোতে। একদিন একটি কর্পোরেট পাসপোর্ট তাদের সুযোগ করে দেবে তাদের জাতীয় নাগরিকত্বের চেয়েও চলাচলের বৃহত্তর পরিসরের স্বাধীনতার।

সঙ্করযুগে আমরা সবাই এক ধরনের পরিচয় সঙ্কটে ভুগতে পারি। প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্যের এবং গণতান্ত্রিক দেশ বনাম স্বৈরতান্ত্রিক দেশের পরিবর্তে আমরা বরং থাকব আরো জটিল বাস্তবতার মধ্যে, যেখানে মানুষ নগর থেকে শুরু করে জনবিচ্ছিন্ন আবাস, করপোরেশন, ক্লাউড কমিউনিটিজ পর্যন্ত সবাই লড়ে ►

হাইব্রিড গাড়ি

হাইব্রিড রোবট

হাইব্রিড প্রজেক্টর

হাইব্রিড মোটর

হাইব্রিড ওভেন

যাবে ও প্রতিযোগিতা করবে তাদের নিজেদের Technik-এর বিকাশ ঘটিয়ে। কিছু কিছু সরকার তার দেশের নাগরিকদের জোগান দেবে Technik। অন্য দেশগুলোর সরকার তা করতে ব্যর্থ হবে। মেগা করপোরেটগুলো সম্ভাব্য পর্যায়ের Technik জোগান দিয়ে অর্জন করতে পারে আনুগত্য। আর যারা তা করতে ব্যর্থ হবে, তারা পেছনে পড়ে থাকবে।

সঙ্করযুগ আগেকার বৈপ্লবিক যুগগুলো থেকে ব্যতিক্রমী হয়ে দ্রুত হয়ে উঠবে একটি বৈশ্বিকযুগ। আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারত পর্যন্ত শত শত কোটি গরিব মানুষ এরই মধ্যে অংশ নিচ্ছে প্রাযুক্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। আর এরা নিজেরা হয়ে উঠেছে দৃষ্টান্ত পরিবর্তনমূলক সেবার উদ্ভাবক। ভারতে প্রতিমাসে প্রায় ১ কোটি নতুন মোবাইল ফোন সংযোগ চালু হচ্ছে। কেনিয়ায় স্থানীয় প্রকৌশলীরা উদ্ভাবন করেছেন 'সাফারিকম' নামের মোবাইল ফোন ব্যাংকিং ব্যবস্থা। আর তা অনেক প্রচলিত ধারার ব্যাংককে তাৎক্ষণিকভাবে করে তুলেছে পর্যাপ্ত সেবাসমৃদ্ধ। TED Conferences-এর স্রষ্টা ক্রিস অ্যান্ডারসন এ ধরনের ডিজরাপশনকে আখ্যায়িত করেছেন 'ক্রাউড-অ্যাক্সেলারেটেড ইনোভেশন' নামে। অতএব আমরা বলতে পারি, গরিব মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে ও উন্নত দেশের জন্য ডিজরাপশন বা সম্প্রতিবিনাশ করতে একটি অপ্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করবে টেকনোলজিক্যাল হাইব্রিড এইজ। তবে বলা দরকার, আমরা এখনো পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারিনি মানবপ্রযুক্তির যৌথ-বিকাশ তথা হিউম্যান-টেকনোলজি কো-ইভোলিউশনের প্রভাবের বিষয়টি। আজকের দিনে যুক্তরাষ্ট্রে মূত্রথলির ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে রোবটের সহায়তায়।

সঙ্করযুগ হচ্ছে সেই যুগ, যে যুগে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা দাবি করতে পারেন : পৃথিবীটা ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। সঙ্করযুগে এ ধরনের বাধাবিপত্তি অতীতের বিষয়। এ যুগে দৃষ্টান্ত পাল্টানোর মতো পরিবর্তন ঘটছে বহু ক্ষেত্রে। অ্যালভিন টফলার যেমন বলেছেন : The future arrives too soon and in the wrong order.

বৈপ্লবিক সম্পদ

রিভোলিউশনারি ওয়েলথ। আমাদের ভাষায় 'বৈপ্লবিক সম্পদ'। টফলার দম্পতি 'রিভোলিউশনারি ওয়েলথ' নামে আরেকটি বই লিখেছেন। এই বইটিতে এরা আমাদের জানিয়েছেন– কী করে আগামী দিনের সম্পদ সৃষ্টি করা হবে, কে পাবে এ সম্পদ, আর কী করেইবা তা পাওয়া যাবে। টফলার দম্পতির মতে, একুশ শতাব্দীর সম্পদ শুধু অর্থের মধ্যে সীমিত নয়। আর শুধু শিল্প বিপ্লবের অর্থনীতি দিয়ে এ সম্পদকে বোঝা যাবে না। এরা দেখিয়েছেন খেলাধুলা, চকোলেট চিপ, কুকিজ, লিনাক্স সফটওয়্যারও সারপ্লাস কমপ্লেক্সিটির মধ্যে একটা সম্পর্ক লুকিয়ে আছে। এরা এদের আগের লেখালেখিতে চালু করেন 'Prosumer' শব্দটি। প্রজ্যুমার হচ্ছেন সেই সব মানুষ, যারা যা ভোগ করেন, তা তারা নিজেরাই উৎপাদন করেন। মোটকথা, বৈপ্লবিক সম্পদের ধারণা দিয়ে এই দম্পতি আমাদের প্রযুক্তির সঙ্করযুগের জন্য তৈরি করেছেন।

আজকের সম্পদ বিপ্লব উন্মোচন করবে অসংখ্য সুযোগ ও জীবনের নতুন নতুন ক্ষেত্র। আর এই সুযোগ উন্মোচিত হবে শুধু সৃজনশীল ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য নয়, উন্মোচিত হবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উদ্যোক্তাদের জন্যও। আজকের দিনে ই-মেইল ও ব্লগিং বিস্ফোরণ চলছে আমাদের চারপাশে। ই-বে আমাদের সবার জন্য বাজার সৃষ্টি করেছে। আগামী দিনের অর্থনীতি করবে উল্লেখযোগ্য মাত্রার ব্যবসায়ের সুযোগ। এ সুযোগ আসবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন– হাইপার অ্যাগ্রিকালচার, কাস্টমাইজড হেলথকেয়ার, ন্যানোসিউটিক্যালস, স্ট্রিমিং পেমেন্ট সিস্টেম, প্রোগ্রামেবল মানি, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, ফ্ল্যাশ মার্কেট, নতুন নতুন জ্বালানি উৎস, নতুন ধরনের শিক্ষা, অমারাত্মক অস্ত্র, ডেস্কটপ উৎপাদন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সব ধরনের সেন্সর, বিশেষ করে আমরা কখন পর্যবেক্ষিত হচ্ছি তা জানিয়ে দিতে সক্ষম প্রাইভেসি সেন্সর এবং আরো হাজারো বিচিত্র ধরনের চমকে দেয়ার মতো পণ্য, সেবা ও অভিজ্ঞতা। আমরা এখনো নিশ্চিত নই এসব পণ্য, সেবা ও অভিজ্ঞতা লাভজনক হবে কখন। কিংবা আদৌ লাভজনক হবে কি না। আর এগুলো একটার সাথে আরেকটা কখন কতদূর সমন্বিত হবে। তবে এটা ঠিক, তখন আমরা শুধু কনজ্যুমার থাকব না, হয়ে উঠব প্রজ্যুমারও। সেখানে আমাদের নজর শুধু টাকার জন্য কাজের মধ্যে সীমিত থাকবে না। নতুন এই সম্পদব্যবস্থা এককভাবে আসবে না, সাথে করে নিয়ে আসবে নতুন এক জীবনব্যবস্থা– নতুন এক সভ্যতা। সেখানে বদলে যাবে যেমনি ব্যবসায়ের কাঠামো, তেমনি বদলে যাবে পরিবার কাঠামোও। আসবে নতুন ধরনের সঙ্গীত ও শিল্পকলা, নতুন নতুন খাবার, ফ্যাশন ও দৈহিক সৌন্দর্যের মান। মানুষের মাঝে জন্ম দেবে ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রশ্নে নতুন মূল্যবোধ ও নতুন প্রবণতা। সবকিছুর মিথস্ক্রিয়া চলবে একসাথে। তা জন্ম দেবে নতুন এক সম্পদব্যবস্থার। যুক্তরাষ্ট্র এই সময়ে ঠিক এ ধরনেরই একটা সভ্যতার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আর সম্পদ সৃষ্টির বৈপ্লবিক উপায়ের পথ বেয়েই দেশটি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভালোর জন্যই হোক আর খারাপের জন্যই হোক, গোটা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের জীবন এই বিপ্লবসূত্রে এরই মধ্যে পাল্টে গেছে বা যাচ্ছে। বিভিন্ন জাতি বা অঞ্চলের উত্থান অথবা পতন ঘটছে, এর প্রভাবকে যেমন উপলব্ধি করতে পারছে তার ওপর নির্ভর করে।

সঙ্করযুগে আমরা

কেউ নিশ্চিত জানেন না, এই অগ্রগতি আমাদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে। তবে একথা নিশ্চিত বলা যায়, সঙ্করযুগের যে প্রযুক্তি, সম্পদ, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার উপায় কোনো দেশ-জাতির যেমন থাকবে না, তেমনি আমাদেরও থাকবে না। অতএব যথাসময়ে প্রস্তুতি নেয়াই শ্রেয়। নয়তো এমনভাবে আমাদেরকে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে হবে, যেখান থেকে সামনে আসার সব পথই একসময় বন্ধ হয়ে যাবে। আজকের দিনে আমরা শুধু প্রযুক্তিপণ্য আর সেবা কিনে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে চাইছি, সে ধ্যান-ধারণা পুঁজি করে সঙ্করযুগের ফসল ভোগ করা যাবে না। আমাদেরকে নামতে হবে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বাণিজ্যিক শাখা হিসেবে বিবেচিত প্রযুক্তির মৌল সব গবেষণায়। তবেই আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ বলি, আর সঙ্করযুগের উপযোগী হাইব্রিড বাংলাদেশই বলি, কোনোটাই অর্জন সম্ভব হবে না। অতএব করণীয় ঠিক করা চাই এখনই। কারণ, কাজে নামতে হবে আর দেরি না করেই। এখন স্লোগান হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ নয়, হাইব্রিড বাংলাদেশ গড়ার। তবেই আসবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সফলতা।

ফিডব্যাক : gmunir@comjagat.com